প্র ব ন্ধ / অ নু বা দ

কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি- কখন? এবং কীভাবে?

জে না কো লা টা / আ বু মো হ ম্ম দ ই উ সু ফ

ইতিহাসবিদেরা বলেন রোগ সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব নানাভাবেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হ'চ্ছে কাদের জন্য এটা সমাপ্ত হয় এবং কার সিদ্ধান্তে?

ইতিহাসবিদদের বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, কোন বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি দু'টি পথের যে কোন একটি পথ

একটি সিসিলি'র ফ্রেস্কো। ১৪৪৫ সনের পূর্ববর্তী শতাব্দীতে 'কালো মৃত্যু (বিউবোনিক প্লেগ) এর সংক্রমণে ইউরোপের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর মৃত্যু হয়।

অনুসরণ করে হয়ে থাকে। একটি পথ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সফল টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কারের মাধ্যমে যখন রোগ সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা নেমে আসে। অথবা সামাজিকভাবে, যখন সমাজে রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় বা আতঙ্কের মহামারী কমে আসে।

রোগতত্ত্ববিদেরা মনে করেন, যখন মানুষ প্রশ্ন করে কখন বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি ঘটবে তখন এটাই ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে তারা বিশ্বমহামারীর সামাজিক সমাপ্তির কথাটাই জানতে চাইছেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি এভাবেও ঘটতে পারে যখন এটা নয় যে নতুন ওষুধ আবিষ্কার এবং চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজে রোগটির সমাপ্তি ঘটেছে বরঞ্চ, মহামারীর কারনে সৃষ্ট আতঙ্কাবস্থায় থাকতে থাকতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং রোগটির সাথে বসবাসের শর্তগুলো শিখে নিতে বাধ্য হয়েছে।

আজকাল, আমরা প্রতিদিন কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারী পরিস্থিতিতে দীর্ঘ লকডাউন নীতির কারনে সৃষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনীতি খুলে দেয়ার চাপের মুখে নানারকম তর্ক-বিতর্ক হতে দেখছি।

এসব তর্ক-বিতর্কের মাঝে অনেকের এই ধারণাটাই বেশী করে সামনে উঠে আসছে যে- বিশ্বমহামারীর তথাকথিত সমাপ্তি চিকিৎসাবিজ্ঞান অথবা জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য দ্বারা নির্ধারিত হবে না-কি এটা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারাই নির্ধারিত হবে।

বিশ্বমহামারীর সমাপ্তির বিষয়টা সত্যি খুব গোলমেলে। ইতিহাসের পেছন দিকে ফিরে তাকালে খুব সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য অথবা বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশ্বে এক একটা ঘটে যাওয়া মহামারী কখন কাদের ক্ষেত্রে শেষ হয়েছে এবং সেটা কখন, কার ঘোষণায় সমাপ্তিতে পৌঁছেছে এসব জানার ক্ষেত্রে অকাট্যভাবে প্রমানিত সুত্রের বিস্তর অভাব রয়েছে।

ভয় ও আতঙ্কের পথে

বাস্তবে রোগাক্রান্ত না হয়েও রোগাক্রান্ত হওয়ার সন্দেহ অথবা আতঙ্কের মহামারী হতে পারে। আয়ারল্যান্ডে ২০১৪ সালে এরকম হতে দেখা দিয়েছিল।

তার কয়েকমাস পূর্বে পশ্চিম আফ্রিকায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং ছোঁয়াচে এবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১১,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়। একসময় এবোলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের সংখ্যা প্রাকৃতিকভাবেই কমে আসছিল এবং যদিও আয়ারল্যান্ডে কোন সংক্রমণের ঘটনাই ঘটেনি তবুও আয়ারল্যান্ডবাসী এবোলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের ভয়ে অযথাই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে সঞ্চারিত এবোলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার গণ-হিস্টেরিয়ায় দারুণভাবে ভুগছিল যখন প্রকৃতপক্ষে আয়ারল্যান্ডবাসী কোন কৃষ্ণাঙ্গই এবোলা ভাইরাসে সংক্রমিত ছিল না।

সে সময় ডাবলিন হাসপাতালের সবাইকে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। হাসপাতালের কর্মীরা চরম উদ্বিগ্ন এবং আতঙ্কগ্রস্থ ছিল এই শঙ্কায় যে যথাযথ সুরক্ষা সামগ্রীর অভাবে তারা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছে। তাই যখন এবোলায় আক্রান্ত একটি দেশে ভ্রমণ করার ইতিহাস আছে এমন একজন রোগী অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে ডাবলিন হাসপাতালের জরুরী বিভাগে হাজির হয় তখন হাসপাতালের কেউ তার কাছে যেতে অস্বীকার করে এবং হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়।কিন্তু, এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে হাসপাতালের অন্য একজন ডাক্তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সেই রোগীকে পরীক্ষা করেন এবং দেখতে পান যে, রোগীটি প্রকৃতপক্ষে সর্বশেষ পর্যায়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন পরেই রোগীটি মারা যায় এবং পরীক্ষা করে দেখা যায় যে রোগীটি এবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিল না।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, আজ পর্যন্ত এবোলা ভাইরাস প্রতিরোধের কোন টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়া সত্ত্বেও ২০১৪ সনে ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যা’ এবোলা বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি ঘোষণা করে এটাকে জরুরী স্বাস্থ্যবিষয়ক উদ্বেগের পর্যায়ে নামিয়ে আনে।

আমরা যে কোন ভাইরাস মোকাবেলার মতো করেই জনগনের মাঝে ছড়িয়ে পড়া আতংক অথবা অজ্ঞতাকে যদি সচেতন এবং সক্রিয়ভাবে মোকাবেলা করতে না পারি, তাহলে যেখানে একটি সংক্রমণের ঘটনাও ঘটেনি তবুও সেখানে সমাজের প্রান্তিকে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এসব ভয়ের মহামারীর আরো অধিক ক্ষতিকর ফলাফল আমরা দেখতে পাই যখন সেই ভয়ের মহামারী আরো জটিলভাবে জাতি, বর্ণ, ভাষা ও অধিনস্ত জনগোষ্ঠিকে নেতিবাচকভাবে জড়িয়ে ফেলার প্রবণতা পায়।

কালো মৃত্যু ও কালো স্মৃতি

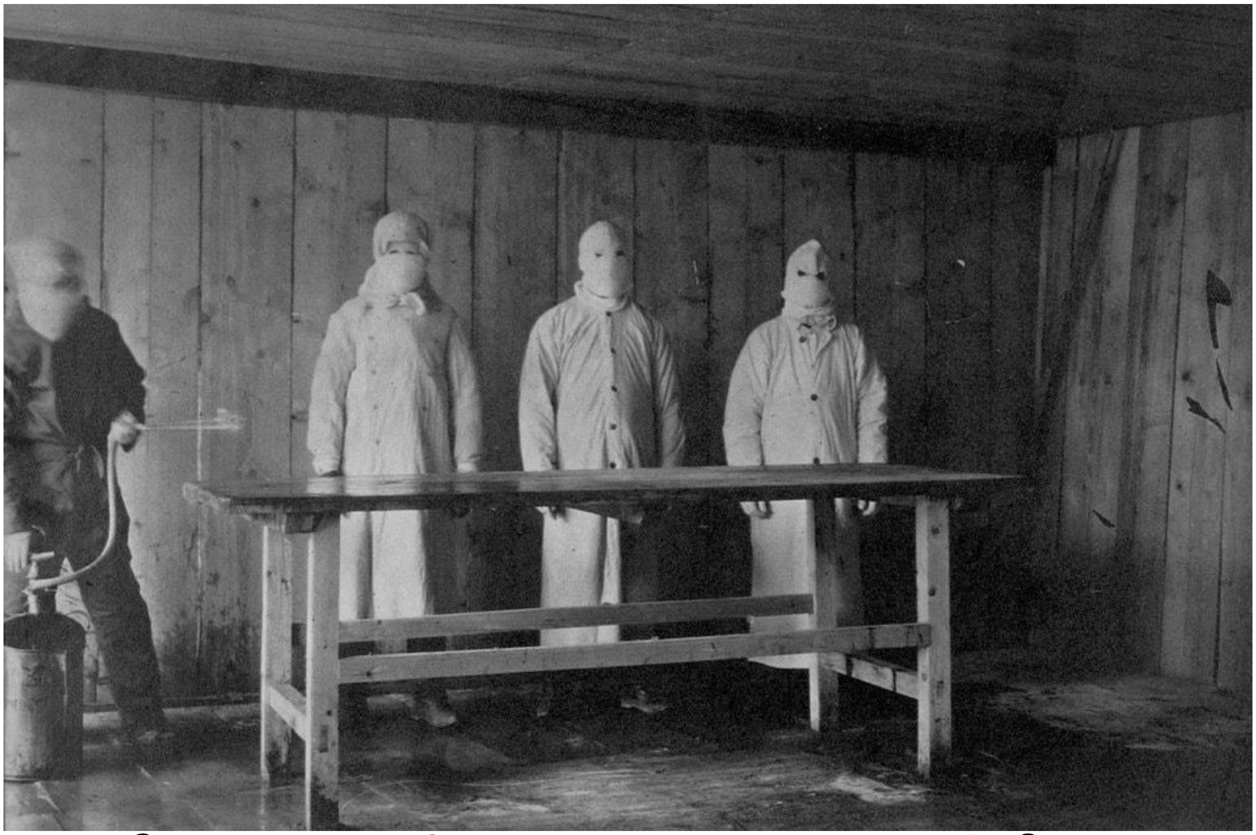

১৯১০ সনে চীনের মুকাডেন শহরের একটি প্লেগ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য ব্যবহৃত টেবিল জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে।

গত ১৫০০ বছরে বহুবার ‘বিউবোনিক’ প্লেগের সংক্রমণ ঘটেছে এবং যেসব সংক্রমণে শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষেরই যে মৃত্যুই ঘটেছে তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্লেগের সংক্রমণের ফলে ইতিহাসের বাঁক বদল ঘটতেও দেখা গেছে। প্রতিবারের সংক্রমণের পর পরবর্তী সংক্রমণ, সংক্রমিত জনগোষ্ঠীর মাঝে আতঙ্কের তীব্রতাকেই বাড়িয়ে তুলেছে। বিউবোনিক প্লেগে সংক্রমিত ব্যক্তির শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ ফুলে যেতো এবং গায়ের বর্ণ কালো হয়ে যেতো। তাই এই প্লেগটিকে “কালো মৃত্যু” নামে উল্লেখ করতেও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বিউবোনিক প্লেগ নামের রোগটি এক প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়ার কারনে ঘটেছে। যার নাম 'ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস'। এই ব্যাক্টেরিয়াটি ইঁদুরের শরীরে বসবাসকারী এক ধরণের মাছিতে থাকে। কিন্তু, বিউবোনিক প্লেগ সংক্রমিত ব্যক্তির লালা কণার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে, তাই ইঁদুর নিধনের মাধ্যমে এই প্লেগ বিদুরিত হয় না।

ইতিহাসবিদেরা, বিউবোনিক প্লেগের তিনটি বড় ঢেউ এর কথা উল্লেখ করেছেন।এই প্লেগের প্রথম সংক্রমণ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেখা যেয় এবং যেটা জাস্টিনিয়ান প্লেগ নামে পরিচিতি পায়। মধ্যযুগে চৌদ্দদশ শতাব্দীতে বিউবোনিক প্লেগ পুনরায় ফিরে আসে এবং তারপর সেটা আবার ফিরে আসে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর বিউবোনিক প্লেগটি কন্সটেন্টিনোপলের রোমান রাজা জাস্টিনিয়ান এর নামে নামকরণ করা হয় কেননা রাজা জাস্টিনিয়ানই প্রথম এই রোগে আক্রান্ত হন যদিও তিনি পরে সুস্থ হয়ে উঠেন।

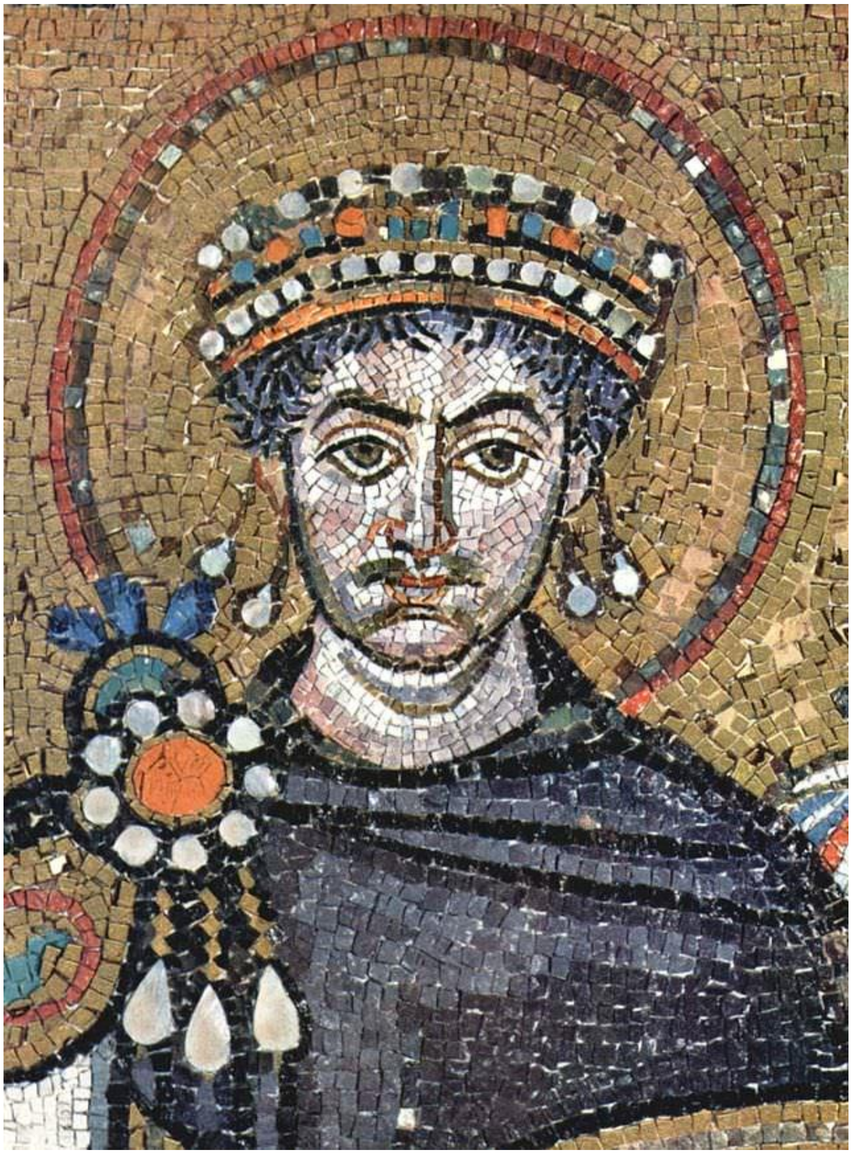
জাস্টিনিয়ান-১

৫৪১ থেকে ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্লেগের সংক্রমণের ফলে ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপ, তৎকালীন বাইজেন্টাইন ও কনস্টেন্টিনোপল সাম্রাজ্যভুক্ত সকল এলাকা, মিশর এবং আরব উপদ্বীপে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠীর প্রাণহানী ঘটে।

এর পর মধ্যযুগে ১৩৩১ সালে চীন থেকে বিউবোনিক প্লেগের বিশ্বমহামারী দ্বিতীয়বার শুরু হয়। প্লেগের এই মহামারী এবং পাশাপাশি চলমান গৃহযুদ্ধে তখন চীনের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর মৃত্যু ঘটে। ক্রমে চীন থেকে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে তখনকার বিশ্ববাণিজ্যের গমনপথ ধরে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায়।১৩৪৭ সাল থেকে ১৩৫১ সাল, এই চার বছরে ইউরোপের ন্যুনতম এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠির মৃত্যু হয়। শুধুমাত্র সিয়েনা এবং ইতালীতে বিউবোনিক প্লেগে মৃত্যুর হার ছিল প্রায় অর্ধেক।

এগনোলো ডি টুরা নামে চৌদ্দদশ

শতব্দীর একজন কাহিনীকারের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, “এই ভয়ানক ঘটনার সত্য বিবরণ মানুষের জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করাই অসম্ভব।এটা বলা যায় যে, এই ভয়াবহ ঘটনা যে দেখেনি তাকে বিশেষভাবে আশীর্বাদপ্রাপ্ত বলা যায়।সংক্রমিত ব্যক্তির বাহুমূল এবং কুঁচকি অস্বাভাবিক ফুলে যায় এবং কথা বলতে বলতেই ধপ করে পড়ে মৃত্যু লাভ করতে থাকে। মৃতের সংখ্যাধিক্যের কারনে তাদেরকে গণকবরে দাফন করা হয়।

ফ্লোরেন্স নগরীর জিয়োভানি বোকাচ্চিও’র বর্ণনায়,“ মৃতদেহ সৎকারের জন্য নুন্যতম শ্রদ্ধাটুকু দেখানো হয় নি যেটা কি-না একটি মৃত ছাগলের জন্যও প্রাপ্য হত পারতো”।কেউ কেউ মৃতদেহ বাড়ীতে লুকিয়ে রাখতো। অনেকেই সংক্রমণের ভয়কে মানসিকভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বোকাচ্চিও’র ভাষায়, “পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানুষ অতিরিক্ত মদ্যপান করতে থাকে, নাচে-গানে মত্ত হয়ে থাকে এবং পৃথিবীর যাবতীয় সুখ এবং আনন্দ উপভোগ করাতেই নিজেদের নিয়োজিত করতে থাকে।সংক্রমণ ও মহামারীর বিষয়টি তারা ঘাড় থেকে এমনভাবে ঝেড়ে ফেলতো চাইতো যেন সেটা একটা বিশাল কৌতুক ছাড়া আর কিছু না”।

ক্রমে বিউবোনিক প্লেগে সংক্রমণের হার কমে আসলে বিউবোনিক প্লেগ বিশ্বমহামারীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৮৫৫ সনে আবার চীনে বিউবোনিক প্লেগ দ্বারা সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় যা ক্রমেই পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তখন শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতেই এই প্লেগের সংক্রমণের ফলে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। বোম্বাইয়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এই প্লেগের সংক্রমণ রোধকল্পে সংক্রমিত অধিবাসী সহকারে এক একটি পাড়া-মহল্লা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ ফ্র্যাঙ্ক স্নোডেন উল্লেখ করেছেন যে, “এতে করে যে সত্যি কোন উপকার হয়েছে কেউ তার প্রমাণ দিতে পারেনি”।

১৯১৪ সনে নিউ অরলিয়েন্সে ইঁদুর ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা।

ড. স্নোডেন লেখেন যে, এটা ঠিক স্পষ্ট নয় যে কী কারনে বিউবোনিক প্লেগ কমে আসে। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি মতামত প্রদান করেছেন যে শীতল আবহাওয়ায় প্লেগের জীবানু বহনকারী মাছিদের মৃত্যু ঘটার কারনে এটা হতে পারে। কিন্তু, দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে- ইঁদুর এবং মানুষ একই বাতাসে শ্বাস গ্রহন করলে শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমেও এই প্লেগের বিস্তার ঘটতে পারে।

অথবা, হয়তো এটা ইঁদুর প্রজাতির বিবর্তনের কারনেও হয়ে থাকতে পারে। কেননা উনবিংশ শতাব্দীতে তখন বিউবোনিক প্লেগের জীবানু বাদামী প্রজাতির ইঁদুরেরা বহন করছিল যারা জাহাজের ইদুরগুলো থেকে আরো শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর ছিল এবং যারা কি-না মানুষের সংস্পর্ষ থেকে দূরেই বসবাস করতো।

“কোন ব্যক্তি হয়তো বাদামী ইঁদুর পোষার ব্যাপারে আগ্রহী নয়”। ডাক্তার স্নোডেন মনে করে।

আর একটি অনুমান যে, বিবর্তনের ফলে ‘ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস’ জীবানুটি দূর্বল হয়ে পড়ে। অথবা মানুষ দ্বারা সংক্রমিত মানুষদের গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দেয়ার ফলে জীবানুটি ছড়িয়ে আর মহামারী আকার ধারণ করতে পারে নি।

তবে প্লেগ মানবসমাজ থেকে একেবারে চলে যায় নি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেইরি অঞ্চলের কুকুরদের মধ্যে এই জীবানুর প্রাদুর্ভাব রয়েছে এবং যেটা কুকুরের লালা থেকে মানুষের শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমেও মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। ডাক্তার স্লোডেন বলেন যে, তার এক বন্ধু নিউ মেক্সিকোর একটি হোটেলে থাকার পর প্লেগ দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। বন্ধুটি থাকার পূর্বে হোটেলের ওই রুমটিতে বসবাসকারীর একটি কুকুর ছিল এবং সেই কুকুরটির শরীরের মাছিতে প্লেগের জীবানু ছিল।

এরকম ঘটনা এখন কদাচিৎ ঘটে এবং সংক্রমিত ব্যক্তিকে এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করা যায়।কিন্তু তবুও প্লেগে সংক্রমিত হওয়ার খবরে এখনও দ্রুত মানুষের মনের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

একটি মহামারী যার বাস্তব সমাপ্তি ঘটে

মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়া রোগসমুহের মধ্যে গুটি বসন্ত রোগটি চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটেছে। এটা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা এইজন্য যে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য একটি কার্যকরী টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, যে টিকা প্রয়োগে একজন ব্যক্তির শরীরে তার সম্পূর্ন জীবনের জন্যই এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়।

‘ভ্যারিওলা মেজর’ নামের এই ভাইরাসটি কোন পশু বা পাখির শরীরে পাওয়া যায় না সুতরাং মানুষের শরীর থেকে এই রোগ নির্মূল হওয়ার ফলে বলা যেতে পারে যে এই ভাইরাস সমস্ত পৃথিবী থেকেই নির্মূল করা হয়েছে।

বসন্ত টিকার প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্ভাবনকারী এডওয়ার্ড জেনার
১৭৯৬ সনে একটি শিশুকে টিকা দিচ্ছেন।

রোগটি ছোঁয়াচে হলেও যেহেতু গুটি বসন্তে গুঁটি আক্রান্ত ব্যক্তিকে রোগের প্রথম পর্যায়েই খুব সহজে চিহ্নিত করা যায় তাই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক ঘরে রেখে সহজেই এই রোগ ছড়িয়ে পড়া থেকে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে।

কিন্তু, তা হলেও যখন গুটি বসন্তের কোন টিকা ছিল না তখন এই মহামারী ছিল সত্যি খুব ভয়ঙ্কর। মহামারীর পর মহামারী প্রায় ৩০০০ বছর পৃথিবীতে ব্যপকভাবে ছড়িয়েছে। গুঁটি বসন্তে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রথমে জ্বর হয় তারপর সারা শরীরে একপ্রকার গুঁটি হতে দেখা যায়, যা কি-না কিছুদিনের মধ্যেই পুঁজে ভরে উঠে এবং শরীরে গুঁটিগুলোর দাগ অবশিষ্ট রেখে একসময় সেটা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। গুঁটি বসন্তে আক্রান্তদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৩ জনেরই মৃত্যু ঘটেছে।

হার্ভার্ডের ইতিহাসবিদ ড. ডেভিড এস জোন্স লক্ষ্য করেন যে, ১৬৩৩ সনে আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া গুঁটি বসন্তের কারনে, “ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনজীবন বিপর্যস্ত হলে অবশ্যই সেই ঘটনা ম্যাসাচুসেটস-এ ইংরেজদের জন্য বসতি গড়ে তোলার অভিযান সফলতার মুখ দেখে”। প্লেমাউথ কলোনীর উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড রোগাক্রান্তদের বিষয়ে একটি বিবরণ লেখেন যে, পুঁজে ভরা ফুস্কুরিগুলো তাদের শুয়ে থাকা মাদুরে বস্তুত আঠার মতো লেগে থাকতো এবং মাদুর ছেড়ে উঠার সময়

ঝরে পরতো। তিনি লেখেন, “সে অবস্থায় মনে হতো যেন গুটির স্থানে শরীরের চামড়া ছাড়ানো হয়েছে এবং সেখানে জমাট রক্ত লেগে থাকার কারনে সমস্ত শরীরের এক দূর্বিসহ দৃশ্য সৃষ্টি করেছে”।

১৯৭৭ সনে বিশ্বে প্রাকৃতিকভাবে গুঁটি বসন্তে আক্রান্ত সর্বশেষ ব্যক্তিটি ছিল সোমালিয়ার একজন পাচক, নাম আলী মাওয় মালিন। গুঁটি বসন্ত থেকে সেরে উঠলেও ২০১৩ সনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছিল।

ভুলে যাওয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা সমুহ

১৯১৮ সনের ইনফ্লুয়েঞ্জার বৈশ্বিক মহামারীটিই উদাহরণ হিসেবে আজকের দিনের মহামারীর ধ্বংস এবং কোয়ারেন্টাইন অথবা সামাজিক দূরত্বের মুল্য অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ১৯১৮ সনের ইনফ্লুয়েঞ্জায় পৃথিবীতে ৫ থেকে ১০ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। এই ইনফ্লুয়েঞ্জায়র মরণ কামড়ে তরুণ থেকে মধ্যবয়সী অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মৃত্যুর ফলে অনেক সন্তান-সন্ততি অনাথ হয় এবং পরিবারের আয় উপার্জন কারী ব্যক্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়। তখন চলমান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যরাও এই ইনফ্লুয়েঞ্জার মরণ কামড় থেকে নিষ্কৃতি পায় নি।

১৯১৮ এর শরতে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত সৈনিকদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য ড. ভিক্টর ভন’কে বস্টনের ক্যাম্প ডিভেন্স’এ পাঠানো হয়। তিনি দেখতে পান, “সৈনিকের পোষাক পরিহিত শত শত বলিষ্ঠ যুবকেরা সেখানকার হাসপাতালের ওয়ার্ডে ১০ অথবা ২০ জনের দল বেঁধে আসছিল। তাদেরকে একে একে হাসপাতালের বিছানায় স্থান দেয়ার পর সমস্ত হাসপাতাল পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। অথচ তখনো ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত সৈনিকদের আগমন থামছিলই না। তাদের চেহারাগুলো নীল হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের পীড়াদায়ক কাশির দমকে দমকে কফের সাথে রক্ত নির্গত হচ্ছিল। আর সকালে তাদের মৃতদেহ মর্গে কাঠের লগের মত স্তুপ করে রাখা হচ্ছিল”।

ড. ভিক্টর ভন আরো লেখেন, “ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রাণঘাতি ভাইরাসটি মানুষের তৈরি যে কোন মারণাস্ত্রের আবিষ্কারকে তুচ্ছ করে তুলেছিল”।

রেডক্রসের স্বেচ্ছাসেবীরা ১৯১৮ এর অক্টোবরে পিডমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়ায় মাস্ক তৈরির কাজে নিয়োজিত।
ছবি কৃতজ্ঞতা- এডওয়ার্ড রজার্স।

এই ইনফ্লুয়েঞ্জাটি সারা পৃথিবীতে ব্যপক মৃত্যুর স্বাক্ষর রাখার পর ক্রমেই বিলীন হয়ে বিবর্তিত মৌসুমী ফ্লু'এর রূপ নেয়, যে ফ্লু দ্বারা বিশ্বের দেশে দেশে মানুষ প্রতিবছর আক্রান্ত হলেও মৃত্যুর ঘটনা অনেক কমে যায়।

ডাক্তার স্নোডেন বলেন, "হয়তো এটা আগুনের মতোই ছিল। সহজ প্রাপ্য জ্বালানী নিধনের পর এটা নিজে নিজেই পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল"।

সামাজিকভাবেও ১৯১৮'এর ইনফ্লুয়েঞ্জা বৈশ্বিক মহামারীর সমাপ্তি ঘটে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল এবং মানুষ নতুন ভাবে সবকিছু আরম্ভ করে নতুন অধ্যায় সুচনা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মানুষ যুদ্ধ এবং মহামারীর দুঃস্বপ্নকে পিছনে ফেলে আসতে উৎসাহী ছিল। সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাস বৈশ্বিক মহামারী, ১৯১৮ এর ফেলে আসা অতীত স্মৃতিকেই আবার সামনে নিয়ে এসেছে।

১৯১৮এর ৫০ বছর পর ১৯৬৮ সনে ফ্লু'এর আর একটি মহামারী দেখা দেয়। কিন্তু সেটা ১৯১৮এর ইনফ্লুয়েঞ্জার বৈশ্বিক মহামারীর মতো ততটা ভয়ঙ্কর ছিল না। ১৯৬৮এর ফ্লু যেটা কি-না হংকং ফ্লু নামেই অধিক পরিচিত, এই ফ্লু'এর সংক্রমণে সারা পৃথিবীতে মোট ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় যাদের সকলেরই বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে ছিল। এই ফ্লু ভাইরাসটি এখনও মৌসুমী ফ্লু'এর মতো মানুষের শরীরে সংক্রমিত হতে দেখা যায় কিন্তু এর সংক্রমণের সাথে বর্তমানকালে জড়িত ব্যক্তিগন এই ফ্লু'এর অতীত মহামারীকেলের বিদ্ধস্ততা এবং ভয়ের স্মৃতি কদাচিৎ স্মরণ করে।

কীভাবে কোভিড-১৯ এর সমাপ্তি ঘটবে?

কোভিড-১৯ মহামারীর বিষয়ে কী ঘটতে যাচ্ছে?

একটি সম্ভাবনার কথা, ইতিহাসবিদেরা বলেন যে, করোনা ভাইরাসের সমাপ্তি চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে শেষ হওয়ার পূর্বে সামাজিকভাবেই ঘটবে। বাধা-নিষেধ এর উপর ক্লান্ত হয়ে মানুষ মহামারীর সমাপ্তি ঘোষণা করবে। যদিও তখনো করোনা ভাইরাস'এর সংক্রমণ জনগোষ্ঠীর মাঝে সক্রিয় থাকবে এবং যদিও তখনো কোন টিকা অথবা কার্যকরী কোন চিকিৎসাব্যবস্থা আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ নাওমি রজার্স বলেন যে, "আমার মনে হয় এক্ষেত্রে ক্লান্তি ও হতাশার একটি সামাজিক মনস্তত্ত্বের বিষয় কার্যকরী হতে পারে। আমরা হয়তো এমন একটা পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছে যাবো যখন মানুষ বলবে- যথেষ্ট হয়েছে, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়াটাই আমার প্রাপ্য"।

এটা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাজ্যে ঘটছে। রাজ্যের গভর্নর'রা কোন কোন ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ উত্তোলন করেছে। চুল কাটার সেলুন, নখ কাটার সেলুন এবং শরীর চর্চা কেন্দ্র খুলে দেয়ার অনুমতি দিয়েছে। যদিও স্বাস্থ্য অধিকর্তারা বলছেন যে এ-ধরনের পদক্ষেপ অকালপক্ক। লকডাউনের কারনে যখন অর্থনীতিতে বিপর্যয় ও ধ্বংসের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে তখন বেশী বেশী করে মানুষ "যথেষ্ট" শব্দটি উচ্চারণ করতে প্রস্তুত হতে পারে।

"ইতিমধ্যেই সমাজে এরকম একটি দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে", ডাক্তার রজার্স বলেন। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে এই বৈশ্বিক মহামারীর সমাপ্তি দেখতে চাইছেন কিন্তু জনগণের একটি অংশ ইতিমধ্যেই এই মহামারীর সামাজিক সমাপ্তি দেখতে চাইছেন।

“প্রকৃতপক্ষে এখনকার পর্যায়ে কে এই মহামারীর সমাপ্তি ঘোষণার দায়িত্ব গ্রহন করতে পারে?”, ডাক্তার রজার্স বলেন। “যদি কেউ করোনা বৈশ্বিক মহামারীর সমাপ্তি ঘোষণার ধারনাটি নিয়ে চাপাচাপি করে, তাহলে আসলে তারা কী নিয়ে চাপাচাপি করছে? যখন তারা বলছে, ‘না এটার সমাপ্তি ঘটছে না।’ আসলে, তারা tokhon কি দাবী করছে?

‘চ্যালেঞ্জ এটাই’, ডাক্তার ব্রান্ড বলেন যে, “কোন হঠাৎ বিজয়ের সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবতে পারি না”। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর সমাপ্তি নির্ধারন, “একটি সময়স্বাপেক্ষ এবং কঠিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হবে”।

(তথ্য সুত্র- নিউ ইয়র্ক টাইমস)

Published May 10, 2020Updated May 14, 2020 New York Times

Gina Kolata

Gina Kolata is a reporter at The Times, focusing on science and medicine. Her training is in science: She studied molecular biology on the graduate level at M.I.T. for a year and a half and has a master’s degree in applied mathematics from the University of Maryland.

Her work at The Times has led her to be a Pulitzer finalist twice — for investigative reporting in 2000 and for explanatory journalism in 2010. Other writing awards include ones in 2010 from the Silurian Society for a series on the war on cancer and from The Associated Press Sports Editors for writing about the Caster Semenya intersex controversy at the world track championships.

In previous years she has received awards from other groups, including the American Association of Health Care Journalists, and the University of Maryland, which gave her a Distinguished Alumnus award. Bowdoin College awarded her an honorary doctoral degree. And she was made a Kentucky Colonel, just like Col. Sanders.

She is the author of six books, the most recent of which is "Mercies in Disguise: A Story of Hope, a Family's Genetic Destiny, and The Science That Saved Them.”

She has also lectured at various universities and medical schools.

Besides working for The Times, her passions include spending time with her family, reading literary fiction, distance running, road cycling, cooking and knitting.

আবু মোহম্মদ ইউসুফ

লেখক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক।